‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটক পর্যালোচনা

ড. রাকেশ জানা

(১)

‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকটি দেশ পত্রিকায় ১৯৬৬ সালে এপ্রিল মাস থেকে পাঁচটি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব বসুর এই নাটক রচনার বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৭ খ্রী: তার ‘কাহিনি’ নাট্যকবিতায় ‘পতিতা’ অংশটিও একই কাহিনি-ঋষ্যশৃঙ্গের পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনেই রচনা করেছিলেন। খুব সম্ভবত বুদ্ধদেব বসু এই রচনাটির দ্বারা পরবর্তী কালে এই কাব্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণ অনুসারে ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করেছিলেন হরিণের শিং নিয়ে। যিনি পরবর্তীকালে তপস্বী হয়ে রাজার মেয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হন। হিন্দু পুরাণে বলা আছে ঋষ্যশৃঙ্গের বাবার নাম বিভান্ডক ঋষি, যিনি স্বর্গের নর্তকী উর্বশী কতৃক যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন। একদা বিভান্ডকের কঠিন তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র ভয় পেয়ে ঋষির তপোভঙ্গ করতে নর্তকী উর্বশীর সাহায্য নেন। উর্বশী বিভান্ডকের ধ্যান ভঙ্গ করেন। সম্মোহিত বিভান্ডক ও উর্বশীর সহবাসে এক সন্তান হয় যার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। এই সন্তান জন্মাবার পরমুহূর্তেই উর্বশীর স্বর্গ থেকে ডাক আসে। সদ্যোজাত সন্তানকে ফেলে উর্বশী স্বর্গে চলে যান। বিভান্ডক এতে উর্বশী তথা সমগ্র নারী জাতির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে লোকালয় থেকে বহুদূরে, স্ত্রী-সংসগহীন নির্জন বনপ্রান্তে সন্তানকে বড় করে তোলেন। শোনা যায় বিভান্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রহ্মচর্য তপস্যায় রত করেন, তাই ঋষ্যশৃঙ্গকে স্ত্রীদের চোখে দেখা তো দূরের কথা স্ত্রীজাতির প্রসঙ্গও অনুল্লেখ রাখেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্যার দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। ঋষ্যশৃঙ্গের কথা এখনো মধ্য নেপালের পাহাড়ে গুল্মি জেলায় লুম্বিনী নামক স্থানে শোনা যায়। এখানে তিনি তপস্যা করেছিলেন। সাহা রাজবংশ ‘ঋদিরুদ্রাবেণী’ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মান প্রদর্শন করে মন্দির নির্মান করে ছিলেন যা বর্তমানে পর্যটকদের ভ্রাম্যমান স্থান হয়েছে। এটি উত্তর প্রদেশে ভারতের সীমান্ত সুনাউলির পাশাপাশি অবস্থিত। রামায়ণের ‘বালকান্ড’ ও মহাভারতের ‘সভাপর্বে’ ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনির উল্লেখ রয়েছে।

কথিত আছে একদা অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ রাজদরবারে এক ব্রাহ্মণের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায়, সেই ব্রাহ্মণ অসম্মানিত বোধ করে রাজত্যাগ করেন। ঐ ব্রাহ্মণের অভিশাপে অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নামে। এই দুর্ভিক্ষ মোচন করে অঙ্গদেশকে শষ্যসমৃদ্ধ করতে পারেন একমাত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের তপস্যারত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে নিয়ে আসা সোজা কাজ নয়। তাই অঙ্গরাজ রোমপাদের নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যা ভঙ্গ করতে রাজ্যের বারাঙ্গনাদের প্রেরণ করা হয়। কখনো স্ত্রীলোককে না দেখা ঋষ্যশৃঙ্গকে বিভান্ডকের অনুপস্থিতিতে বারাঙ্গনারা সহজেই মোহবিষ্ট করে অঙ্গদেশে নিয়ে

আসে; রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়। অঙ্গদেশে এরপর বৃষ্টিধারা নেমে আসে। রামায়ণে 'বালকাণ্ডে' কথিত আছে এই ঋষ্যশৃঙ্গেরই দ্বারা অযোধ্যার রাজা দশরথ সন্তান কামনার জন্য পুত্রকামেষ্ঠি যজ্ঞ করেন; যার ফলাফল স্বরূপ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত- শত্রুঘ্নর জন্ম হয়। কথিত আছে দশরথ ও কৌশল্যার প্রথম সন্তান হল শান্তা। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদ ও তার স্ত্রী বর্ষিনী রাজা দশরথ ও কৌশল্যার কাছ থেকে শান্তাকে দত্তক নেন। বর্ষিনী হলেন সম্পর্কে শান্তার মাসী, কৌশল্যার বড় বোন। পরবর্তীকালে শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ হয়।

বৌদ্ধ পুরাণে ৫২৬ জাতকের কাহিনীতে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রসঙ্গ উল্লেখিত রয়েছে। বৌদ্ধপুরাণ মতে হিমালয়ে তপস্যারত এক তপস্বীর মূত্রে বীর্য নিষিক্ত হয়। সেই মূত্র যে স্থানে পড়ে সেখানকার ঘাস খেয়ে এক হরিণী সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। সেই হরিণী এক মনুষ্যসন্তান প্রসব করে যার মাথায় শিং রয়েছে। ওই সদ্যোজাত শিশুটিকে তপস্বী লোকলায় থেকে দূরে, স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে নিভৃতে বড় করে তোলেন তার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। এই বালক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইনারই তপের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আকাল দেখা দেয়। দেবরাজ ইন্দ্র এতে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সেই রাজ্যের রাজাকে পরামর্শ দেন যে— রাজকন্যাকে দিয়ে সেই তপস্বীর তপস্যাভঙ্গ করে, সেই রাজ্যে নিয়ে আসতে। পরিকল্পনামাফিক রাজকন্যা তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ করে তাঁকে সেই রাজ্যে নিয়ে আসেন এবং বিবাহ করেন। রাজ্যে বৃষ্টি ধারা নামে, ক্রমশ ধরণী সুফলা ও শষ্যশ্যামলা হয়ে ওঠে। সেই তপস্বীর রাজ্যাভিষেক হয়। তাঁদের বত্রিশটি সন্তান হয়, পরবর্তীকালে তিনি স্ত্রী-পুত্রদের পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর তপস্যাবলে পুনরায় তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ফিরে আসে।

(২)

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে প্রথমাঙ্কের সূচনায় রাজদূত (সুশ্রুত, মাধবসেন) ও গাঁয়ের মেয়েদের মুখে অঙ্গরাজ্যে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর চেহারা প্রকাশ পায়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বৃষ্টি হলেও এই রাজ্যে রাজসভায় এক অপমানিত ব্রাহ্মণের অভিশাপে বৃষ্টি নেই। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে খাদ্যের সাহায্য পাঠানো হলেও তা নিয়তির অমোঘ বিধানে হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়েছে, নয় দস্যুরা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই সকলের চোখে উৎকণ্ঠা ও ভীতি প্রকাশ পেয়েছে। সবাই রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী—কিভাবে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এই ভাবনায় সকলে চিন্তিত। ঠিক তখনই রাজপুরোহিতের মুখে শোনা গেছে এই দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায়। একমাত্র ঋষ্যশৃঙ্গই পারেন অঙ্গরাজ্যের বিপদ নিবারণ করতে। তাই দ্বিতীয় অঙ্কে রাজপুরোহিতের নির্দেশ মত ব্রহ্মচর্যের তপস্যারত অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষ মোচনার্থে বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীর সাহায্যে মোহাবিষ্ট করিয়ে অঙ্গদেশে নিয়ে আসা হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীকে এই কাজে রাজি করানোর জন্য বারাঙ্গনাশ্রেষ্ঠী তরঙ্গিনীর মা লোলাপাঙ্গীর

প্রসঙ্গ এসেছে। তার অর্থলিপ্সা, সন্তানপ্রীতি ও বৃত্তির কৌশল এই অঙ্কের উপাদেয় বস্তু। এই অঙ্কে জানা গেছে রাজকুমারী শান্তা মন্ত্রীপুত্র অংশুমানকে ভালোবাসে। তাই শান্তা নিজে থেকেই মন্ত্রীর কাছে তাদের ভালোবাসা ও বিবাহ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। কিন্তু রাজপুরোহিতের নির্দেশ মতো রাজ্যের স্বার্থে শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে হবে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিনীর বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতির সুযোগে ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলুব্ধ করার কৌশল দৃশ্যগুলিই এর মূখ্য বিষয়। নারীজাতির প্রসঙ্গ অজ্ঞতার সুযোগেই ঋষ্যশৃঙ্গকে বশীভূত করা হয়েছে। এই অঙ্কে পিতা-পুত্রের কথোপকথনে নাট্যকার দ্বন্দ্বের পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের মোহদশাই তাঁকে পিতার নির্দেশ অমান্য করতে বাধ্য করেছে। সে ভ্রমে পড়ে তরঙ্গিনীর ফাঁদে পা বাড়িয়েছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তাই দেখা যায় রাজনীতির যূপকাষ্ঠে শান্তা ও অংশুমানের প্রেমকে বলি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কল্যাণার্থে শান্তা প্রণয় পুরুষ অংশুমানকে ত্যাগ করে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করেছে। ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার বিবাহপূর্বে যাতে অংশুমানের সাথে শান্তার দেখা না হয় তার ব্যবস্থা নিতে অংশুমানকে রাজকারাগারে বন্দী করা হয়। এই অঙ্কে তরঙ্গিনী চরিত্রটির চিত্তবৈকল্য লক্ষ্যণীয়। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে শান্তার বিবাহে রাজ্যে বৃষ্টি ধারা নামে। প্রকৃতি আবার শষ্যশ্যামল হয়ে ওঠে— অঙ্গদেশে গৃহে গৃহে সুখ-সমৃদ্ধি নামে। রাজ্যবাসী আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তরঙ্গিনীর হৃদয়ে আনন্দ নেই। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহাবিষ্ট করতে গিয়ে নিজেই তার সরলতায় আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় দিয়ে ফেলে। সে হাসতে ভুলেছে, খেতে ভুলেছে, সাজও ভুলেছে, ভুলেছে তার বৃত্তিকে। এক নিরানন্দময় নিভৃতস্থানে একাকী তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কল্পনায় সে দিনযাপন করছে। তার এই উন্মাদিনী দশায় মা লোলাপাঙ্গী ও প্রণয় পুরুষ চন্দ্রকেতু চিন্তিত। চন্দ্রকেতু তরঙ্গিনীর সাক্ষাৎপ্রার্থী, সে তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ কানেই তুলতে চায় না। তাই চন্দ্রকেতু লোলাপাঙ্গীর সাহায্যে তরঙ্গিনীকে বিবাহ প্রস্তাব দেয়। লোলাপাঙ্গীর সুপরামর্শ ও তরঙ্গিনীর কল্যাণচিন্তা এ অঙ্কের উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। এখানে তিনজনের কথোপকথনে তরঙ্গিনীর মানসিক বিকারের কারণ ধরা পড়ে। এই বিকারের ওষুধ শুধু ঋষ্যশৃঙ্গই দিতে পারেন তা সকলেই বুঝতে পারে। তাই সকলেই তাঁর সাক্ষাৎ চান। এই অঙ্কেই রাজঘোষকের মুখে শোনা যায় ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্যাভিষেকের বার্তা। রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমানকে নাট্যকার এই অঙ্কে নিয়ে আসেন, তার মানসিক উদ্বেগ ও প্রণয় হাহাকার ফোটানোর উদ্দেশ্যে। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করেও সে শান্তাকে ভুলতে পারে না। তাই আজ সে সকলের কাছে জবাব চায়— ফিরে পেতে চায় শান্তাকে। চন্দ্রকেতুর কাছে তার হতভাগ্যের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীকে দোষারোপ করে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় রাজ্যবাসীরা ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্যাভিষেকের দিনে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে রাজপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁদের আশীর্বাদ করছেন, সকলেই খুব খুশি। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের মনে সুখ নেই। আজ তাঁর রাজ্যাভিষেক তাও কোন

কিছুর অপ্রাপ্তি তাঁকে সর্বদা ঘিরে রেখেছে। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার মতো পত্নী ও সন্তান পেয়েও চরম অসুখী। রাজমহলে তাঁকে সর্বদা প্রজা মনোরঞ্জনের একগোঁয়ে কর্তব্যে অবিচল থাকতে দেখা গেছে। এক বছরের দাম্পত্য জীবনে সুখী না শান্তাও। পতি-পুত্র কি নেই তার, তবুও তার গানে ধরা পড়ে বেদনার ইতিহাস। তবে স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালনে তার নিষ্ঠার অভাব হয়নি। এরপর নাটকের চরমক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পিতা বিভাণ্ডক এসেছেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রতি অভিমান বশতঃ আশ্রমে ফিরে যেতে চায় না। কারণ যখন ছলনার আশ্রয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গদেশে নিয়ে আসা হয়, তখন বিভাণ্ডক ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অঙ্গদেশে ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু অঙ্গদেশের দুর্দশায় তিনি পীড়িত হয়ে রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করে পঞ্চদশ গ্রাম উপঢৌকন নিয়ে, ঋষ্যশৃঙ্গকে সেখানে রেখে আশ্রমে ফিরে যান। এতে ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার প্রতি অভিমন করেন; ভাবেন পিতা সামান্য উপঢৌকনের বিনিময়ে তাঁকে রাজার কাছে দান করেছেন। ফলে, বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অসমর্থ হন। এরপর রাজমহলে মন্ত্রীপুত্র অংশুমান প্রবেশ করেছে। এই অংশে শান্তার হৃদয়দ্বন্দ্ব আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অংশুমান ঋষ্যশৃঙ্গকে তার ভাগ্যের বিপর্যয়ের কাহিনি শুনিয়ে শান্তার প্রতি তার ভালোবাসা ব্যক্ত করে— জবাব চায়। অংশুমানের কণ্ঠস্বর শুনে শান্তা অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাদের প্রেমকাহিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে না শোনাতে অংশুমানের কাছে কাতর আবেদন করেছে। কিন্তু অংশুমান শান্তা বিহনে কাতর, সে আজ রাজ্য চায় না— চায় শান্তাকে। তাই ব্যর্থ হয় শান্তার আবেদন। ঋষ্যশৃঙ্গও লক্ষ্য করেন শান্তার মনের টানাপোড়েনকে। ঠিক এই চরম মুহূর্তেই তরঙ্গিনীর মানসিক বিকারের শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে শঙ্কিত মা লোলাপাঙ্গী ও শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমিক চন্দ্রকেতু ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়। লোলাপাঙ্গীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গের কোন এক মুখের কথা মনে পড়ে— যাকে তিনি এক বৎসর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ জানতে পারেন লোলাপাঙ্গীর পরিচয়— সে তরঙ্গিনীর মা। এই সন্ধিক্ষণে তরঙ্গিনীও তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হয়। তরঙ্গিনী রাজবেশে বদলে যাওয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে হতাশ হন, তিনি ফিরে পেতে চান অপাপবিদ্ধ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে। ফিরে পেতে চান সম্মোহিত সেই মুহূর্তকে—সেই মুখকে, যার বাণীতে সরলতাভরা নারীস্তুতি রয়েছে। তরঙ্গিনীকে দেখা মাত্রই ঋষ্যশৃঙ্গের সব অপ্রাপ্তির ক্ষুধার নিরসন ঘটেছে। তিনি আজ মুক্ত। তাই অন্তঃপুরে গিয়ে রাজবেশ ছেড়ে তপস্বীর বেশ ধারণ করেন। এরপর সকল সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে দেখা যায়। অংশুমানের হাতে শান্তাকে অর্পণ করে তার কৌমার্য ফিরিয়ে দেন। আশীর্বাদ দেন শান্তর সন্তান যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হবে। এরপর নিজ মুখেই তরঙ্গিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। তরঙ্গিনীই তাকে পুরুষ ও স্ত্রীর পার্থক্য বুঝিয়েছে; চিনিয়েছে তাঁর পুরুষ প্রকৃতিকে। তার ভালোবাসা অন্য সকলের থেকে নিঃস্বার্থ ও প্রকৃত তাই ঋষ্যশৃঙ্গ তার এই উন্মাদ দশায় কাতর হয়েছে। তিনি

জানেন তরঙ্গিনীর এই অবস্থা থেকে মুক্তির সন্ধান তাকে নিজেকেই করতে হবে তাই তার মাতা লোলাপাঙ্গী ও শুভাকাঙ্ক্ষী চন্দ্রকেতুকে ফিরে যেতে বলেন। আশীর্বাদ দেন তারা খুব শীঘ্রই তরঙ্গিনীকে হারানোর বেদনা ভুলে যাবে। বিভাণ্ডক আবার সেখানে উপস্থিত হয়ে পুত্রকে আশ্রমে ফিরিয়ে নিতে যেতে ব্যর্থ হন। ঋষ্যশৃঙ্গ জানান তাঁর সাধনার পথ একাকী, তাকে আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে; তাই এই পথে অন্য কারো সাহায্য ও সহাবস্থান নিষিদ্ধ। এই বলে তিনি সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্যের সাধনায় বেরিয়ে পড়েন। তরঙ্গিনীও তাঁর পিছু পিছু 'সেই মুখের' সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রাজপুরোহিতের নির্দেশে এরপর রাজকুমারী শান্তার অংশুমানের সঙ্গে পুনর্বিবাহের মাধ্যমে নাটকের সমাপ্তি ঘটে। বুদ্ধদেব বসু 'অভিনয়' অংশে একস্থানে নাটকের মূল বিষয় সম্পর্কে বলেছেন—

"লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে ক'রে থাকে তারই প্রভাবে দু-জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো—নাটকটির মূল বিষয় হ'লো এই।"[১]

৩

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক। এটি রামায়ণ থেকে নেওয়া একটি কাহিনির অংশবিশেষ। তবে উপাদান যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক আধুনিক নাট্যসাহিত্যে মানবিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনিই শোনানো হয়ে থাকে। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক সাহিত্যের দিকপাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলিও (প্রথম পার্থ, অনামী অঙ্গনা) পুরাণাশ্রিত হলেও পুরাণের পুনর্মূল্যায়নে তিনি বিশ্বাসী। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকের সমালোচনার এক অংশে তিনি বলেছেন— "সর্বোপরি স্মর্তব্য; এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো ক'রে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলাবাহুল্য এ ধরণের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না, কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হ'য়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন..."[২] পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্মণানুসারে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো ভক্তিরসগাঢ়তা। তাছাড়া অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকতা, নীতিপ্রতিষ্ঠা, অবতারত্ব, ভক্তি ও বিশ্বাসের জয়, সর্বশেষে মৃত্যু ও বিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্তি না ঘটিয়ে পরলোকে মিলন ও প্রশান্তি দেখানো। সেই হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকের পৌরাণিকত্ব বিচার করতে গেলে এতে পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্মণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে ক্ষেত্রবিশেষ নাটক্যারের কল্পনা পৌরাণিকত্বকে ছাপিয়ে আধুনিক নাট্যমানসিকতার উপযোগী হয়েছে। পুরাণের কাহিনির সামান্য রদবদল করে এখানে শান্তা-অংশুমান উপকাহিনিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে অবাস্তব বা অপার্থিব লীলা সেভাবে দেখা যায় না শুধুমাত্র নাটকের শেষখণ্ডে (চতুর্থ) ঋষ্যশৃঙ্গের আশীর্বাদগুলি অলৌকিক লক্ষণাযুক্ত, কেননা

স্মৃতিবিলুপ্ত হওয়ার আশীর্বাদ, কুমারীত্ব প্রদান— সাধারণ যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তবে নাটকের শিল্পের স্বার্থে এই ধরনের অলৌকিক কর্মকাণ্ড দেখানো হয়ে থাকে। এই নাটকে শান্তার জীবনবৃত্তান্তকে মিলনাত্মক বলতেই হবে। পৌরাণিক নাটকের লক্ষ্মণানুযায়ী শান্তা-অংশুমান উপকাহিনিতে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্তি না ঘটিয়ে মিলন দেখানো হয়েছে। তবে তরঙ্গিনীর ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে তার জীবন বিষাদময়—বিচ্ছেদময় মনে হলেও নাট্যকার পাঠক বা দর্শকের মনে এই আশা দিয়ে সমাপ্তি করেছেন যে তাদের মিলন হবে পরলোকে।

৪

এই নাটকে মূল চরিত্র দুটি তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী। এদের কেন্দ্র করে নানা চরিত্রেরা ভিড় করেছে যথা—বিভাণ্ডক, লোলাপাঙ্গী, রাজমন্ত্রী, শান্তা, অংশুমান, রাজপুরোহিত চন্দ্রকেতু, রাজদূত ও গ্রামের মেয়েরা। তবে এই নাটকে শান্তা ও অংশুমান উপকাহিনী নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি যার পৌরাণিক সত্যতা নেই। অনেকসময় তাই মনে হয় নাট্যকার এই দুটি চরিত্রকেও তপস্বী ও তরঙ্গিনীর পাশে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নাটকে যেমন বারাঙ্গনা জীবনের চিত্র রয়েছে ঠিক তেমনি তপস্বীর আশ্রম ও রাজ অন্তঃপুরের জীবনও নাট্যকার বিচক্ষণতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠী তরঙ্গিনীর মা লোলাপাঙ্গীর বক্তব্যে বারাঙ্গনা জীবনের পরিচয় যেমন মেলে ঠিক তেমনি শান্তা, অংশুমান, রাজমন্ত্রীর বক্তব্যেও তাদের গর্বোদ্যত রাজবংশীয় স্বভাব ও উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক সেখানেই আবার আমরা তপস্বীবেশী সরল ঋষ্যশৃঙ্গের মধুর প্রেমাপ্লুত বচনে প্রীত হই। তা যাই হোক এই নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ-ই নায়ক চরিত্রের মর্যাদা দাবী করে। যখন অঙ্গরাজ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের অপমানের অভিশাপে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, বৃষ্টির অভাবে ক্ষরার পরিস্থিতি দেখা দেয় ঠিক তখনই রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল অঙ্গরাজ্যের এই দুর্দশা মোচন করতে পারেন শুধুমাত্র বিভাণ্ডক পুত্র তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি পিতার আশ্রমে ব্রহ্মচর্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অপাপবিদ্ধ, নারীপ্রসঙ্গে অজ্ঞ যোগী পুরুষ। জন্মাবধি এযাবৎ তিনি স্ত্রী জাতিকে দেখেননি। রাজপুরোহিতের নির্দেশমতো অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনতে গেলে তাঁর ব্রহ্মচর্যকে নষ্ট করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যের বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠী লোলাপঙ্গীর পুত্রী তরঙ্গিনীকে তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়। তরঙ্গিনী বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিতে ঋষ্যশৃঙ্গের নারী জাতি প্রসঙ্গ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, তাঁকে মোহাবেষ্ঠিত করে। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গকে মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। পিতা বিভাণ্ডকের নির্দেশমতো এযাবৎ তপশ্চর্যা পালন করতেও তাঁর মনে আনন্দ নেই। তাই তরঙ্গিনীর হঠাৎ উপস্থিতি তাঁর মনে বিস্ময়াবিভূত আনন্দের সঞ্চার করেছিল। তরঙ্গিনীর পেলব মুখ, রূপের উজ্জ্বলতা, দেহসৌষ্ঠব ও পোশাকের জৌলুস দেখে ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলে ভ্রমিত হন। রূপোন্মত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকে দেখে ও তার সাথে কথোপথনে

এক 'দুর্লভ চিত্ত প্রসাদ অনুভব' করেন। তাঁর মনে হয় এতদিনে তিনি মনের আনন্দকে খুঁজে পেয়েছেন। তরঙ্গিনীর প্রতি দুর্বলতাই তাঁকে পিতা বিভাণ্ডকের শেখানো নিয়ম, নিষ্ঠা ও তপশ্চর্যা থেকে বিরত করে। তিনি তরঙ্গিনীর রতি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজের পুরুষ প্রকৃতির পরিচয় পান। তরঙ্গিনীর শরীরী আকর্ষণে পিতার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন—"...আমি অস্নাত থাকবো, তোমার স্পর্শের শিহরণ যাতে জাগ্রত থাকে। আমি অভুক্ত থাকবো, তোমার চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করবো তোমাকে।"[৩] বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্মোহিত হওয়ার ছলনা থেকে রক্ষা করতে নারীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর জন্ম ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বর্ণনা করে বিভাণ্ডক তপস্বীর মহান আদর্শ তুলে ধরেন। তবুও ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীর ফাঁদে পা বাড়িয়ে অঙ্গদেশে পাড়ি দেন। রাজকুমারী শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অঙ্গদেশে বৃষ্টিধারা নেমে আসে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শোনা যায় তাঁর রাজ্যাভিষেকের বার্তা। চতুর্থ অঙ্কে রাজবেশী ঋষ্যশৃঙ্গকে দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী বলে মনে হয়; অথচ কি নেই তাঁর, পতিব্রতা স্ত্রী, পুত্র, বিরাট সম্পত্তি। প্রজা দর্শন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এক নিয়মানুবর্তিতার হৃদয়হীন কর্মে রাজবেশ পরে তিনি সারা দিন-রাত্রি আচ্ছন্ন রয়েছেন। তাঁর আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে কাউকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বোঝাপড়ার জন্য। এই পরিস্থিতিতে বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁর আশ্রমে ফিরিয়ে আনতে গেলে তিনি পিতার উপর পূর্বের এক কারণবশতঃ অভিমান করে বসেন। আসলে ঋষ্যশৃঙ্গকে যখন ছলনা করে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসা হয় তখন বিভাণ্ডক অঙ্গরাজ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সেখানে ছুটে আসেন, পুত্রকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। কিন্তু এখানকার দুর্দশা বিভাণ্ডককে ব্যথিত করে। তিনি পঞ্চদশ গ্রাম অঙ্গরাজ্যের কাছে উপঢৌকন নিয়ে একবছর অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাখা ও তার পুত্র হলে তাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার শর্তে রাজি হন। ঋষ্যশৃঙ্গকে কোন কিছু না বলে বিভাণ্ডকের এভাবে চলে আসায় ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবেন যে, সামান্য গ্রাম দান গ্রহণের মাধ্যমে বিভাণ্ডক তাঁকে রাজা লোমপাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গের এই ভুল বশতঃ অভিমান চতুর্থ অঙ্কে বিভাণ্ডকের সঙ্গে কথোপকথনে মেটে। অবশেষে নাটকের চরমক্ষণ উপস্থিত হয় যখন রাজমন্ত্রী পুত্র অংশুমানের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ জানতে পারেন স্ত্রী শান্তার বিবাহপূর্ব প্রণয় বৃত্তান্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ এই বৃত্তান্ত শুনে স্ত্রীর প্রতি রাগে ফেটে পড়েননি। বরঞ্চ শান্তার উপস্থিতিতে তাঁর না বলা কথায় বিবাহপূর্ব প্রণয়ী অংশুমানের প্রতি উৎকণ্ঠায়, বুঝে নিয়েছিলেন ভালোবাসার গভীরতাকে। শান্তা এই প্রণয় বৃত্তান্তে লজ্জিত ও ব্যথিত হলে বিচক্ষণ ঋষ্যশৃঙ্গ তার প্রণয়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেছেন সে কোন অপরাধ করেনি। আসলে তাদের দাম্পত্য মিলনমুহূর্তে শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গ দু'জনেই ছিল চরম অতৃপ্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ অকপটে তাঁর অতৃপ্তি স্বীকার করে শান্তাকে জানিয়েছেন— "শান্তা, এতদিনে সত্য বলার সময় হ'লো। রাত্রে, অন্ধকারে—তুমি যখন আমার বাহুবন্ধনে ধরা দিতে, আমি কল্পনা করতাম তুমি শান্তা

নও—সেই অন্য নারী। কিন্তু অন্ধকারেও সমতা নেই, শান্তা, অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি। আমি তাই অতৃপ্ত। ... হয়তো তুমিও কল্পনা করতে, আমি ঋষ্যশৃঙ্গ নই, অংশুমান। সেই ছলনা আজ শেষ হ'লো। আজ শুভদিন।"[৪] ঋষ্যশৃঙ্গের 'সেই অন্য নারী—তরঙ্গিনী, সে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেমে আজ উন্মাদিনী। এই চরমক্ষণে তার উপস্থিতিতে জটিল প্রণয় সমস্যার সমাধান বেরিয়ে আসে। ঋষ্যশৃঙ্গের শেষ বোঝাপড়ারও অবসান ঘটে। তরঙ্গিনীর উন্মাদিনী অবস্থার কারণ যে তিনি একথা উপলব্ধি করে ঋষ্যশৃঙ্গ দুঃখী হন। তিনি আজ তরঙ্গিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি যে পুরুষ ও নারী প্রসঙ্গে তাঁর জ্ঞানের উদয় ঘটিয়েছিল। একমাত্র তরঙ্গিনীই তাঁকে উদ্দেশ্যবিহীন ভালোবেসেছিল, যা পিতা বিভাণ্ডক ও স্ত্রী শান্তার ভালোবাসায় ছিল না। বিভাণ্ডকের উদ্দেশ্য পুত্রের ব্রহ্মচর্যের সাফল্যে পুণ্যভোগ, আর শান্তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাজবাড়ীর মঙ্গলার্থে তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাই তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে যে কি?— এ প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের মতামত তুলে ধরলাম—

"...এই যুবতী আমার ইপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ— যেখানে আমি হর্ববারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিনী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিল। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে। সে আমার পরিত্যাজ্য নয়, সে আমার — অন্তরঙ্গতার কাছে — অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে — আমি ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই — একমাত্র তারই কাছে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিল ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমি তাকে আমার অধিকারিণী রূপে স্বীকার করি।"[৫]

এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশ ত্যাগ করে তপস্বী বেশে ফিরে আসেন— খুঁজে পান তাঁর হারিয়ে যাওয়া আনন্দকে। তাই নিজে ব্রহ্মচর্যের সাধনার জন্য নিরুদ্দেশে যাবার পূর্বে শান্তাকে স্ত্রী মর্যাদা থেকে মুক্ত করে অংশুমানের হাতে অর্পণ করেন, ফিরিয়ে দেন শান্তার সতীত্ব। তরঙ্গিনীর স্বজন ও বান্ধবকে পরামর্শ ও আশীর্বাদ দেন তরঙ্গিনীর কষ্ট ভোলার জন্য। আর পিতা বিভাণ্ডককে বলেছেন তিনি একাকী সাধনা করতে চান, যে সাধনায় প্রয়োজন নেই পিতার—স্ত্রীর—পুত্রের—প্রেমিকার— তাঁর সাধনমার্গ ভিন্ন। ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রের অভিনয় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তার চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন—; "অন্তবর্তী এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজপুরুষোচিত বৈদগ্ধ ও কপটতা, বেঁকিয়ে ব্যাঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন— অথচ তাঁর সহজাত শুদ্ধতা এখনো অস্পৃষ্ট। জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা— এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ঐ সাংসারিকতা—রাজবেশের মতোই—তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র; যে মুহূর্তে

লোলাপাঙ্গীকে দেখে তাঁর চমক লাগলো (মাতাকে দেখে কন্যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক) তারপর 'তরঙ্গিনী' নামটি শুনতে পেলেন, সে-মুহূর্ত থেকেই জেগে উঠতে লাগলো তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা; তরঙ্গিনীকে চোখে দেখার পর থেকে নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তাঁর লুকোচুরি, আর রইলো না। তাই, যখন তিনি তপস্বীবেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা দিলো এমন এক স্বপ্রকাশ মহত্ত্ব, যা অন্যেরা সহজে ও সবিনয়ে মেনে নিলে।"[৬]

এই নাটকের অপর এক প্রধান চরিত্র হলো বারাঙ্গনা লোলাপাঙ্গীর পুত্রী তরঙ্গিনী। রাজমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে সে ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করে রাজকুমারী শান্তার কাছে সমর্পণ করেছে। মা লোলাপাঙ্গী তাকে সমস্ত শিক্ষা, (রূপচর্চা, স্বাস্থ্যের যত্ন, স্নান, ব্যায়াম, পথ্যের সমুদয়, সাজ-শৃঙ্গার, গহনার তত্ত্ব, অর্থ শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, পূজা, ব্রত, পার্বনের বিধিমানা, পাশাখেলা, নাচ-গান-অভিনয়) দিয়ে নিপূণ রূপে গড়ে তুলেছেন। এই শিক্ষার গুণেই সে রাজ আজ্ঞা তথা মাতৃ আজ্ঞার পালনার্থে সিদ্ধান্ত নিতে প্রত্যয়ী ভূমিকা পালন করেছে। ঋষির ব্রহ্মচর্য ভঙ্গের মতো দুঃসাধ্য কর্ম করেছে। তরঙ্গিনী নিজের রূপে ও গুনের প্রতি চরম আত্মবিশ্বাসী, তার পেশাদারিত্বের পরিচয় রাজমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।— "প্রভু, আমার সর্বস্ব বলতে আর কী আছে— শুধু এই শরীর। তার অধিকারী কে নয়, বলুন— রোগী, উন্মাদ, নপুংসক ও ভিখারি ছাড়া? যে আমাকে মূল্য দেয় তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি — শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত আমার কাছে সকলেই সমান।"[৭] নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে তাকে সখী দল ও রতিদ্রব্য নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মোহাবেষ্ঠিত করতে দেখা যায়। ঋষ্যশৃঙ্গের জিজ্ঞাসার কৌশলী উত্তর দিতে তার তুলনা মেলা ভার। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে তার সাধন প্রণালী বর্ণন করেছে — তার ধর্ম পরিচর্যা, সে অনঙ্গব্রতে অঙ্গীকৃত, তার পণ আত্মদান। তার সাধনমার্গ প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গকে বলা কথাগুলির মধ্যে গোপনীয়তা নেই তবে চাতুর্য রয়েছে— "আমার মন্ত্রের নাম রতি, আমার যজ্ঞের নাম প্রীতি, আমার ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ। আমার সাধনমার্গে একাকিত্ব নিষিদ্ধঃ দুই তপস্বী যৌথভাবে এই ব্রত পালন করেন।"[৮]

ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কথোপকথনে সে সমসময় সাবধানতা অবলম্বন করেছে কারণ কোন ত্রুটি তার mission-কে ব্যর্থ করতে পারতো। তাই সখীদল নিয়ে গেলেও সে নিজের প্রচেষ্টায় এই অসাধ্য কর্ম করেছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের সূচনায় আমরা তরঙ্গিনীর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি। সেই সদা উচ্ছাসময়ী নারী যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। সে নিজের যত্ন নেওয়া ভুলেছে, ভুলেছে তার বৃত্তিকে। সর্বদা যেন কার চিন্তায় সে বিভোর হয়ে থাকে। আসলে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্যভঙ্গ করতে গিয়ে সে অপাপবিদ্ধ তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের সরলতা ও মধুর বচনে মুগ্ধ হয়ে, হৃদয় দিয়ে ফেলেছে। ঋষ্যশৃঙ্গের পূর্বে অনেক পুরুষই তার রূপে ও

গুণের প্রশংসাবাক্য স্তুতি করেছে, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে সরল বচনে, প্রাণের আবেগে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল। তাকে দেবতাভ্রমে স্তুতি করেছিলো। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' নাট্যকবিতার 'পতিতা'-র অংশবিশেষ। এই কবিতায় বারাঙ্গনা রাজমন্ত্রীর দেওয়া পুরস্কারের অর্থ ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি ছলনার জন্য তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে মিলনমুহূর্তে তার নিষ্পাপ সরল বচনে, তিনি মুগ্ধ। তাই রাজমন্ত্রীর প্রতি তার মুগ্ধতার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন—

> "মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
> স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
> তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
> শুনি নি এমন সত্যবাণী।
> ....
> আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
> এনেছি বহিয়া নূতন দিবা-
> অমৃত সরস আমার পরশ,
> আমার নয়নে দিব্য বিভা
> আমি শুধু নই সেবার রমনী
> মিটাতে তোমার লালসা ক্ষুধা
> তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
> আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।"   (৯ই কার্তিক, ১৩০৪)

'তপস্বীও তরঙ্গিনী' নাটকেও ঋষ্যশৃঙ্গ এভাবেই তরঙ্গিনীকে শাপভ্রষ্ট দেবতাভ্রমে বন্দনা করেছিলেন।

তরঙ্গিনী অঙ্গরাজ্যের কল্যাণে ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তার কাছে সঁপে ভেবেছে কেন সে ঋষ্যশৃঙ্গকে কাছ ছাড়া করলো? কেন ছিনিয়ে নিয়ে এলো না ঋষ্যশৃঙ্গকে? তাই নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মানসিক অস্থিরতা হেতু স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে সে আজ উন্মাদিনী। আজ ঋষ্যশৃঙ্গকে হারিয়ে সে চরম অতৃপ্ত। আবার রাজ ঘোষকের মুখে ঋষ্যশৃঙ্গের রাজ্যাভিষেকের খবর পেয়ে সে ভেবেছে— প্রিয়তম ঋষ্যশৃঙ্গ হয়তো সুখেই আছে। তার মানসিক দোলাচল অবস্থার বর্ণনা নাট্যকার তার মুখ দিয়েই বর্ণনা করেছেন— "দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধী? তার বাহুতে কি আরো বিলাল অভ্যর্থনা? অঙ্গে-অঙ্গে লাস্য আরো উচ্ছল? ... রাজকুমারী শান্তা! জামাতা! যুবরাজ! তুমি কি তৃপ্ত? তুমি রাজপুরীতে তৃপ্ত? শান্তার পুষ্পশয়নে তৃপ্ত? আমার লজ্জা, আমার গর্ব, আমার যন্ত্রণা! আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত।"[৯] অতঃপর মাতা লোলাপাঙ্গীর সুপরামর্শ ও চন্দ্রকেতুর বিবাহপ্রস্তাবে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায়

ফিরিয়ে আনার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কাটানো সুখস্মৃতিগুলোকে খুঁজে পেতে চেয়েছে — 'আমি চাই আমাকে প্রতি মুহূর্তে আমাকে আমি চাই তোমাকে। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আয়নায় আমি নিজেকে দেখতে পাবো দেখতে পাবো আমার আসল মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, আমিও কেউ দেখিনি।' আর এই তরঙ্গিনীর সঙ্গে নাটকের মূলসুর বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত Yeats এর কবিতার দুটি পংক্তির মিল রয়েছে।

I am looking for the face I had
Before the world was made

আসলে তরঙ্গিনী সেই মুখের সন্ধান করেছে যা সে অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে লক্ষ করেছিল। পরবর্তীকালে নাটকের চতুর্থ অঙ্কে এসে রাজবেশী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলেও সে ওই মুখ ওই দৃষ্টি আর খুঁজে পায় না। সে পরিস্থিতির চাপে বদলে যাওয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে হতাশ হয়। এরপর ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশ ত্যাগ করে তপস্বী বেশে ফিরে এলে তরঙ্গিনীকে প্রকৃতিস্থ হতে দেখা যায়। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গ কামনা করে তার সাধনার সঙ্গী হতে চেয়েছেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনার পথ একাকী তাই তরঙ্গিনী থেকে যায় উপেক্ষার আড়ালে। প্রেমিক ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে প্রণয়িনী রূপে স্বীকার করেও তাকে উন্মাদিনী অবস্থার থেকে মুক্তি দিতে পারেননি—শুধু ব্যথিত হয়েছেন মাত্র। তরঙ্গিনীর মুক্তি ও শান্তির পথ তাকে নিজেকেই সন্ধান করতে হবে। এই নাটকে তাই তরঙ্গিনীর জীবন বিয়োগ ব্যথায় পরিপূর্ণ। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে রাজমহলে মন্ত্রীপুত্র অংশুমান ও শান্তা তার প্রেম নিবেদনের ধৃষ্টতায় কটুবাক্য প্রয়োগে তাকে মহল থেকে নির্বাসিত করতে চায়। আসলে সে সমাজে শিষ্ট মহলে বারাঙ্গনার প্রেম নিবেদন ভালো চোখে দেখা হতো না। তারা ছিল নিন্দার পাত্র। তাই নাট্যকার যেন প্রচ্ছন্নে থেকে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখ দিয়ে তরঙ্গিনীর সম্মান রক্ষার্থে প্রশংসোক্তির দ্বারা এই অবস্থার প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে ভালোবেসে সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে অনির্দিষ্ট পথের পথে যাত্রা করেছে। তরঙ্গিনী চরিত্রের মহত্ত্বতা তাই প্রশংসনীয়। এই নাটকের প্রথমাঙ্কে রাজকার্য সাধনের উদ্দেশ্যে বারাঙ্গনা শ্রেষ্ঠা লোলাপাঙ্গী ও তার কন্যা তরঙ্গিনীর আগমন। রাজমন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে তার প্রগলভতা ও অর্থলোভ লক্ষ করার মতো। ঋষির তপোভঙ্গ করতে স্বর্গের অপ্সরারা ধরাধামে বারবার দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে অনেকে অভিশপ্ত হয়ে মনুষ্যেতর প্রাণী কিংবা ভস্ম হয়েছে। লোলাপাঙ্গী রাজমন্ত্রীকে এই কথা শুনিয়ে কন্যা তরঙ্গিনীর অভিশপ্ত কিংবা প্রাণহানী হওয়ার ভয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে এ সমস্তই তার চাতুরী তার ব্যবসার দরবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। আসলে প্রাণহানি তথা অভিশপ্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে সে রাজমন্ত্রীর কাছে অধিক অর্থ আদায়ের কৌশল করেছে। রাজমন্ত্রী একথা উপলব্ধি করেও রাজ্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, অন্যান্য উপঢৌকন ও

সুবিধা প্রদান করার কথা দিলে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়েছে। সম্ভাব্য বিপদের কথা বলে নিজেদের দরকে কিভাবে বৃদ্ধি করতে এ প্রশিক্ষণে সে সকলের গুরু। তার কথা শুনে আবার কন্যা তরঙ্গিনী যাতে ভয় পেয়ে কর্তব্য থেকে বিচলিত না হয়,তার জন্য উপদেশ দিয়েছে, শিখিয়ে দিয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গকে আকৃষ্ট করার পদ্ধতি—

"...দর্পণে একবার দেখিস নিজেকে, তাহ'লে আর ভয় থাকবে না... কাল প্রভাতে ঋষ্যশৃঙ্গকে মৃগয়া করবি তুই; ব্যাধের মতো চতুর হবে তোর পদপাত, অব্যর্থ হবে শরসন্ধান। যার বাণ উদ্যত, সেই ব্যাধের দিকে মৃগশিশু যেমন সরল চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনি হবে এই কিশোরের দৃষ্টিপাত— তুই যখন সামনে গিয়ে দাঁড়াবি।...—তিনি এতদিন তপস্যা করে যা পাননি, তুই তাঁকে দিবি সেই ব্রহ্মানন্দস্বাদ। তুই, এই অভাগিনী লোলাপাঙ্গীর কন্যা তরঙ্গিনী!"[১১] যুদ্ধক্ষেত্রে নামার পূর্বে যেমন সেনাপতির তেজদীপ্ত অভিভাষণ যুদ্ধজয়ের কারণ হয়, ঠিক তেমনই এক্ষেত্রে লোলাপাঙ্গী সেই ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের তৃতীয়াঙ্কে তরঙ্গিনী যখন ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে আহার, বেশভূষা, প্রসাধন এমন কি জীবিকা পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলো তখন লোলাপাঙ্গী মা হয়ে তাকে সুপরামর্শ দিয়ে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায়, তরঙ্গিনীর শুভাকাঙ্ক্ষী প্রণয় পুরুষ চন্দ্রকেতুর সাথে তার কৌশলে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। চতুর লোলাপাঙ্গী হয়তো ভেবেছিলো এভাবেই কন্যার মানসিক ব্যাধি দূর করা যাবে। তার কন্যার শুভ কল্যাণকর চিন্তার পাশাপাশি তার অর্থলোলুপতাও সমান্তরাল ভাবে সত্য। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু লোলাপাঙ্গীর অভিনয় প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রেখেছেন যার দ্বারা তার চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। — "...লোলাপাঙ্গী চরিত্রটি যেন কখনোই 'কমিক' হয়ে না ওঠে (অভিনেত্রী অসতর্ক হ'লে তা হ'তে পারেনা তা নয়); তার কোন কথার ভঙ্গিতে দর্শকের যদি প্রবল হাস্যোদ্রেক হয়, সেটা হবে নাট্যকারের বিষয়বস্তুর পক্ষে অত্যন্ত বেসুরো, এবং নাট্যকারের পক্ষে মর্মান্তিক।... কখনো - কখনো (বিশেষত প্রথম অঙ্কে) লোলাপাঙ্গী আমাদের মৃদু কৌতকু জাগাতে পারে, কিন্তু সমগ্র নাটকে তাঁর বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না; মনে রাখতে হবে তার পক্ষে অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম। কন্যার সঙ্গে ব্যবহারে তার চরিত্রের এই দুই দিক সমপরিমাণে সক্রিয়, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে ব্যবহারে বিভাণ্ডকের ও পরিচালক যুগপৎ পিতৃস্নেহ ও পূণ্যলোভ। নাটকের সর্বশেষ মুহূর্তে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর অভিনয় হবে অতি সুকুমার, বোঝাতে হবে যে তাদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতন ভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তারা, কেননা তরঙ্গিনীকে হারাবার পরেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং, ঈষৎ করুণ; যেহেতু তারা সাধারণ এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য।"[১২]

নাট্যকার শান্তা চরিত্রের পুরাণত্বের অবসান ঘটিয়ে তাকে আধুনিক নারী চরিত্র

হিসেবে গড়ে তুলেছেন। শান্তা বুদ্ধদেব বসুর কল্পিত নারী চরিত্র। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহের পূর্বে রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমানকে ভালোবাসতো। কিন্তু রাজ্যের পাপমোচনের স্বার্থে সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। নাটকের প্রথমাঙ্কে রাজমন্ত্রীর কাছে নিজেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার সঙ্গে অংশুমানের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তাকে প্রগলভা নারী বলে মনে হলেও—আসলে তা নয়। যাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করার জন্য তার আন্তরিক বাসনা সতীত্বের লক্ষণযুক্ত।— "অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি, কোষাধ্যক্ষ আমাদের নিষ্ঠা আর প্রজাগণ আমাদের দৃষ্টি, হাসি, সংলাপ আমাদের স্বপ্ন ও ভাবীকল্পনা।" [১৩]

সে জানতে পেরেছে রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে বিয়ে করার কথা। তাই রাজমন্ত্রীর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে সে ভবিষ্যতের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে— "তাত, আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা— সামান্যা এক যুবতী। দেহে ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক বধূর পার্থক্য নেই। আমিও চাই পতি, সন্তান, গৃহ—চাই প্রেম-পরিণতি-বন্ধন। চাই সেবা ও স্নেহবৃত্তির স্থায়ী সার্থকতা। এমন যদি হয় যে আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্যদান ক'রে, তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আমাকে ত্যাগ করলেন? যদি তাঁর মনে হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়াপুত্র নিতান্ত অলীক।"[১৪] তার এই উৎকণ্ঠা পরবর্তীকালে তার ভবিতব্য হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গের সাথে তার দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের হয়নি। চতুর্থ অঙ্কে রাজ অন্তঃপুরে তার বিষাদময় গানে এর আভাষ মেলে—

"সুন্দর তুমি পেটিকা
অন্তরে নেই রত্ন
পাত্র এখনো মণিময়
নিঃশেষ তার সৌরভ

...

আসে যায় দিন —রজনী
আসে জাগরণ, তন্দ্রা
শুধু নেই হৃদস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।"[১৫]

ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনে সে স্ত্রীর দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে। তবুও দু'জনের কথপোকথনে রোমান্টিক আকুলতা নেই— আছে নিছক কেজো কথার নিয়মাবর্তিতা। শান্তার বেশবাসও তার হৃদয়ের দৈন্যতার পরিচয়বাহী। শান্তার এই আত্মছলনা অবশ্য বেশিদিন চলে না। অংশুমানের ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে শান্তার ও নিজের অতীত প্রেমের ঘটনা বর্ণনায় সত্যের পর্দা উন্মোচন হয়। অবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার দাম্পত্য সম্পর্কে পরস্পরের হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করে প্রেমাস্পদের সঙ্গে সহবাসের কল্পনার

অবসান ঘটে। নাটকের শেষদৃশ্যে তাই ঋষ্যশৃঙ্গ, শান্তাও অংশুমানের প্রণয়বৃত্তান্ত জানতে পেরে— শান্তাকে কৌমার্য ফিরিয়ে দিয়ে, তাকে অংশুমানের হাতে প্রত্যার্পণ করেন। অংশুমান যখন ঋষ্যশৃঙ্গকে তাদের প্রণয়বার্তা শোনাচ্ছিল তখন রাজ অন্তঃপুরে জানালার আড়ালে থেকে শান্তার গোপন উৎকণ্ঠা ও অংশুমানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তার হৃদয়ের ব্যাগ্রতা লক্ষ্য করার মতো। আবার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তার বিবাহপূর্ব প্রণয় সংবাদ গোপন করতে অনুরোধ করায় লজ্জিত কাতর আহ্বানে, তার পতিব্রতা হওয়ার পরিচয় মেলে। তা যাই হোক শান্তার অংশুমানের সঙ্গে পুনর্বিবাহ এই নাটকের সর্বোপরি চর্চিত বিষয়। — এক পৌরাণিক সধবা নারী পতি থাকতে থাকতে দ্বিতীয়বার প্রেমাস্পদকে কিভাবে বিবাহ করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে নাট্যকার নিজেই— "...চতুর্থ অঙ্কের শেষের দিকে রাজমন্ত্রী তা নিয়েই স্বভাবতই চিন্তিত; ঘটনাকে বিশ্বাস্য ক'রে তোলার জন্যই সত্যবতী, কুন্তী ও দ্রৌপদীর নজির আমি ব্যবহার করেছি। কোনটা আগে কোনটা পরে সে-কথা এখানে অবান্তর; আসলে আমি দেখাতে চেয়েছি যে প্রাচীন হিন্দু সংস্কার অনুসারে, দেবতা বা ঋষির বরে নারীর কৌমার্য যেহেতু প্রত্যার্পনীয় তাই অংশুমানের সঙ্গে শান্তার বিবাহ প্রথাবিরোধী নয় আর সেই জন্যই রাজপুরোহিত এই দ্বিতীয় পরিণয় অনুমোদন করলেন।"[১৬]

আসলে আধুনিক নারীর কাছে সতীত্বের প্রতিষ্ঠা তার দেহে নয়, মনে। যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহের পূর্বে শান্তা অংশুমানকেই পতিরূপে স্বীকার করেছিলো তাই ঋষ্যশৃঙ্গের আশীর্বাদ তথা অনুমোদন করার পর শান্তার অংশুমানকে বিবাহ করতে অসুবিধা হয়নি।

ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন বনপ্রান্তে, স্ত্রী সংসর্গ বাঁচিয়ে ব্রহ্মচর্যের সাধনায় রত রেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পুত্র ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ হয়ে উঠুক। — "আমি তোমার মধ্যে ঋষিত্বের লক্ষণ দেখেছি; মন্ত্রের উশাতা শুধু নয়, মন্ত্রের স্রষ্টা হবে তুমি; হবে ব্রহ্মবেত্তা, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়—হবে ত্রিলোকের পূজনীয় — তুমি, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ।"[১৭]— এটা ছিল তাঁর কাছে সম্মানের—গর্বের। বিভাণ্ডকের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছিলো অঙ্গরাজ্যের রাজার চক্রান্ত। তাঁরই প্রেরিত বারাঙ্গনা তরঙ্গিনীর ছলনায় ঋষ্যশৃঙ্গ ব্রহ্মচর্যের অনুশীলন ত্যাগ করে অঙ্গরাজ্যে গমন করে। বিভাণ্ডক এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে আনতে অঙ্গরাজ্যে ছুটে যান। কিন্তু অঙ্গদেশের দুর্দশা তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করে। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে রাজকুমারী শান্তার বিবাহ যে অঙ্গরাজ্যের দুর্দশা নিবারণার্থে তা বুঝতে পেরে, এটাই ভবিতব্য বলে মেনে নেন। অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে এক চুক্তি করে তিনি অঙ্গরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে এক বছরের শর্তে রেখে, পঞ্চদশ গ্রাম উপঢৌকন নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান। বিভাণ্ডক চরিত্রে যেমন স্নেহপরায়ণ ও সন্তান বৎসল পিতার ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি; ঠিক তেমনি সন্তানের কৃতীত্বের ফল, পুন্যলোভের জন্য লালায়িত হতেও লক্ষ্য করা যায়। একদা তিনি হিমালয়ে ঘোরতর ব্রহ্মচর্যের তপস্যা করেছিলেন যা দেবরাজ ইন্দ্রের ভীতির কারণ হয়।

তাই উর্ব্বশীকে দিয়ে তিনি বিভাণ্ডকের তপস্যা ভঙ্গ করেছিলেন। এরপর বিভাণ্ডক কামোন্মত্ত হয়ে এক কিরাত রমনীকে সম্ভোগ করে তাঁর ব্রহ্মচর্য হারান, ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। সদ্যোজাত ঋষ্যশৃঙ্গকে ছেড়ে কিরাত রমনী বনমধ্যে পালিয়ে গেলে তিনি প্রচণ্ডভাবে নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'— তাই নারীসংসর্গ বাঁচিয়ে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে বড় করে তোলেন। ঋষ্যশৃঙ্গের এই নারী প্রসঙ্গ অজ্ঞানতাই তার বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। একথা বিভাণ্ডক উপলব্ধি করে নিজেকে তিরস্কার করেছেন— "আমি তোমাকে আপাপচেতন রাখতে চেয়েছিলাম— ভুল করেছিলাম। পাপ সর্বগ, তার সম্ভাবনা অসীম। তার সংক্রাম থেকে বাঁচতে হ'লে তার স্বরূপ জানা প্রয়োজন।"[১৮] তাই সন্তানের মোহমুক্তি ঘটাতে নারীর প্রসঙ্গ ও তার জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করে তাকে সাবধান করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের মোহদশা কাটাতে তাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এই মোহবন্ধন ছিন্ন করার জন্য।— "নারী মোহিনী, দেবগণেরও কাম্য, কিন্তু তপস্বীরা তার মায়াজাল ছিন্ন করতে পারেন। শুধু তাঁরাই, সেই জন্য ব্রহ্মর্ষিরা দেবতার চেয়েও মহনীয়, তাঁদের পলকপাতে স্বর্গ কেঁপে ওঠে, ইন্দ্র, বরুণ, আদিত্যগণেরও আরাধ্য তাঁরা... [১৯] এছাড়াও উপদেশ দিয়ে তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে এই মোহবন্ধনের মায়াজাল ছিঁড়তে হবে— "যোগাসনে ব'সে ইন্দ্রিয়রোধ করলে তোমার কোন ভয় থাকবে না।"[২০] কিন্তু সব উপদেশ ব্যর্থ হয়, ঋষ্যশৃঙ্গের নিয়তি তাকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসে। নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বিভাণ্ডক এক বছর পর ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডকের উপর অভিমান করে। ভাবে বিভাণ্ডক সামান্য গ্রাম উপঢৌকন নিয়ে তাকে অঙ্গরাজ্যের কাছে সমর্পণ করেছে। বিভান্ডক এই কথা শুনে তার ভুল ভাঙান। পুত্রের আত্মপীড়ন ও অভিমানের জায়গাটা অনুভব করে, তাকে রাজ্যসুখ ও সমৃদ্ধির তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তি দিতে আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর এই আহ্বানে ঋষ্যশৃঙ্গ সাড়া দেয় না। ঋষ্যশৃঙ্গ কারো সাহায্য ছাড়া একাকী সাধনা মার্গে হাঁটতে চান; তাই ব্যর্থ হয় বিভাণ্ডকের চেষ্টা।

এই নাটকে অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, রাজদূত প্রভৃতি চরিত্রগুলি পাঠকদের মনে সেরকমভাবে দাগ কাটেনি। নাট্যকার অশুমানের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করলেও ঋষ্যশৃঙ্গের নির্বিকার-নির্বিবাদ মনোভাবে-এর সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। বিচক্ষণ ঋষ্যশৃঙ্গের নির্লোভ মনোভাবে ও স্বাভাবিক তেজস্বীগুণে সকলে তাঁর পরামর্শ ও যুক্তি মেনে নেয়। অংশুমানের শান্তাকে প্রত্যার্পণের দাবিও তিনি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে মেনে নিয়েছেন। তাই শান্তাকে হারিয়ে তাঁর এতটুকু আক্ষেপ নেই। তাঁর কামোন্মত অবস্থা অবশেষে নিঃস্বার্থ প্রেমের পথে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে।

(৫)

১৯৫৫ খ্রী: মহাজাতিসদনে 'কবিতা মেলা'য় কাব্যনাটক প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়। কবি কৃষ্ণধর কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেছেন— কবিতায় একধরনের মুক্তি সন্ধানের

তাগিদেই কাব্যনাটকের উৎপত্তি। অর্থাৎ কাব্যনাটককে প্রথমে কবিতা হতে হবে এবং অভিনয়ের উপযুক্ত হতে হবে। নাট্যকাব্যের সঙ্গে কাব্যনাটকের পার্থক্য এখানেই যে কাব্যনাটকে নাটকীয় ভাবদ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াদ্বন্দ্ব অপেক্ষা কাব্যের আবেগ বেশি থাকে আর অপরক্ষেত্রে নাট্যকাব্যে কাব্যের ভাবাবেগ অপেক্ষা নাটকীয় ভাবদ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াদ্বন্দ্বের উপস্থিতি বেশি প্রত্যক্ষ হয়। এই বিচারে বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী" নাটকটিকে আমরা কাব্যনাট্য বলতে পারি। কেননা এই নাটকে ছন্দে গ্রথিত কাব্যময় সংলাপ, চরিত্র ও ঘটনার ক্রমবিবর্তনের দ্বারা, ভাবদ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াদ্বন্দ্ব অপেক্ষা বেশি প্রত্যক্ষ। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে তরঙ্গিনীর রূপস্তুতি করার সময় ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ কাব্যময়—"সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নিধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋকছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে, বিশ্বকরুণার বিকিরণ।"[২১] আবার অন্যত্র নাটকের চতুর্থাঙ্কে তপস্বীবেশি ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনী প্রসঙ্গে বলেছেন— "সহস্র নয়—একজন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিলো। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো। সে সে-ই আমার বন্ধন, সে–ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।[২২] আবার অনেকক্ষেত্রে এই নাটকে কবিতার গদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অংশুমান চতুর্থ অঙ্কের এক জায়গায় বলেছে— "শান্তা আমার রাজত্ব। শান্তা আমার সসাগরা পৃথিবী"[২৩] প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় নাট্যউৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে—আবেগময় সংলাপগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাব্যময় হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। বুদ্ধদেব বসু। তপস্বী ও তরঙ্গিনী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। আগস্ট ১৯৬৬। পৃষ্ঠা—৯৮।
২। তদেব, ভূমিকা অংশ। জুলাই ১৯৬৬। কলকাতা।
৩। তদেব, পৃ-৪৪।
৪। তদেব, পৃ-৮৩।
৫। তদেব, পৃ-৮৩।
৬। তদেব, পৃ-৯৮।
৭। তদেব। পৃ-২৪।
৮। তদেব। পৃ-৩৫।
৯। তদেব। পৃ-৬৪।
১০। তদেব। পৃ-৬১-৬২।
১১। তদেব। পৃ-২৬,২৭।
১২। তদেব। পৃ-৯৭,৯৮
১৩। তদেব। পৃ-২০।
১৪। তদেব। পৃ-২০।

১৫। তদেব। পৃ-৬৭-৬৮।
১৬। তদেব। ভূমিকা অংশ। জুলাই ১৯৬৬। কলকাতা।
১৭। তদেব। পৃ-৪৪।
১৮। তদেব। পৃ-৪১।
১৯। তদেব। পৃ-৪৩।
২০। তদেব। পৃ-৪৪।
২১। তদেব। পৃ-৩২।
২২। তদেব। পৃ-৮৭।
২৩। তদেব। পৃ-৭৭।